একান্ন বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১৪২৫

শ্রদ্ধার্ঘ্য

একজন মানুষ একটি ভাষার প্রতিভূ-রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা! পৃথিবীতে এমনটি আর নেই। তাইতো তুমি বিশ্বকবি! তুমি বাংলা ভাষার গর্ব। আমরা তোমার জন্য গর্বিত। আমরা বাংলা ভাষার জন্য গর্বিত। তোমার আলোকের ঝর্ণাধারায় আমরা স্নাত হই, উজ্জ্বল হই, পবিত্র হই। তোমাকে প্রণাম।

কৃশানু ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।। ৫১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।। ১৪২৫।।

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা - ৭০০০০৯।। krishanupatrika@gmail.com

সূচিপত্র

সম্পাদক	*প্রচার ও জনসংযোগ*	*প্রচ্ছদ ও ইন্টারনেট*
মনন দাস	**সমীর বেতাল**	**প্রদীপ মণ্ডল**

হারিয়ে যাওয়া

রথীন কর

তোমার সকাল সন্ধ্যা
তোমার কবিতা সভা
তোমার শাসন-ভাঙা নূপুর
তোমার উজান পথে চলা।

উড়ছে পলাশ উড়ছে শিমুল
বেলা যে যায়
ডাক দিয়ে যাও
অবেলায়

শূন্য ঘরে মূর্ত তুমি
বার দরজায় একক তুমি
আর কিছু নয়, তোমার কথায়
হারিয়ে যাওয়া
সর্বনাশের জীবন ধারায়।

ভালো লেগেছে

সর্বেশ্বর জানা

বসেই আছি শুয়েও থাকি জমে উঠছে জমে যাচ্ছি
সাত সতের ভাবি ভাবছি বেশ লাগছে বুঝতে পারছি
বেঁচেই আছি তাই তো আজ ফুলের ফোয়ারা পাখির কোলাজ
উষ্ণ প্রস্রবণ পাহাড়ি ঝর্ণা সুন্দরী বনানী স্নিগ্ধা কন্যা
সমুদ্রে ঢেউ নদির গতি চাঁদের আলো সূর্যকান্ত মতি
শিশুদের মিষ্টি কলকলানি কুমারীর বাঁক প্রেমের হাতছানি
কোকিলের কুহু মায়েদের মায়া গানের গমক বাসন্তী হাওয়া
আমের বোলে নাচের তালে উৎসবি মেজাজ সাত সকালে
বাঁচার আনন্দ প্রাণের স্পন্দন কবিতার ছন্দ অলির গুঞ্জন
আমরা সবাই একসাথে বেঁচে তাই তো এত ভালো লেগেছে।

মনখারাপের ছবি

মহাজিস মণ্ডল

আকাশে বেলা শেষের গান
ইচ্ছে নদী পেরিয়ে
পাখিরা ফিরছে যে যার ঘরে
তুমি তখনও ঠায় বসে
টুকরো টুকরো রঙ জমা করছো
একটা মন খারাপের ছবি আঁকবে বলে...

চারটি হাইকু

রাজীব পাল

১.
চৌকাঠে ঘুণ
অন্ধ দেয়াল বাঁচে
ঝরছে চুন

সূর্যের ভোরে
স্বপ্ন দেখানো রোদ
ছায়াও ঘোরে

নিজের সঙ্গে
আজন্ম পথে পথে
অনন্ত রঙ্গে।

নির্জনে ঘাসে
ছড়িয়ে দি'নিজেকে
মিথ্যের চাষে।

স্থাবর অস্থাবর

মনন দাস

যে জমি খেয়েছে নদী
সেও তো স্থাবর ছিল
সেই প্রাসাদ, যার অলিন্দে দাঁড়িয়ে
সে নদীকে ভালোবেসেছিল
সেও তো স্থাবর ছিল
নদী তাকে ভালোবেসে গর্ভে নিয়েছে।

এখন, সে এক অস্থাবর মানুষ
উদভ্রান্ত ঘোরেফেরে
নদী তীরে।

মৌলিনাথ বা ডায়োজিনিস

শান্ত রায়

মৌলিক চিন্তাবিদ সে-ই, যে
বলতে পারে, এমনকি,
সম্রাটকেও ঃ
'দাঁড়াও একটু স'রে, রোদটুকু
আসতে দাও-না-না, আমি
চাই না
আর কিছু!'

ফিরে দেখা

অদিতি ব্যানার্জি

সঙ্গ তার মেলে বায়ুহীন ধোঁয়ায়
পর করে দেয় সে হঠাৎ এক কথায়,
সে নাকি তৃপ্ত পুরুষ, তার ভঙ্গিমায় অতৃপ্ত এ বিশ্ব।
বিস্তারিত অবুঝ কথায় সে চিরজীবী
উন্মোচিত সংকীর্ণ দুয়ারে সে আজ মর্মাহত।

বটবৃক্ষ

ধ্রুব বসু

সকালবেলার সমুদ্র সন্ধ্যায় শান্ত হয়ে যায়।
দুটি ধর্মের মানুষ তখন
বটবৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়ায়
মাথার ওপর
নীড়ফেরা অসংখ্য পাখিদের
কলতানে মায়ার বন্ধন,
যেন এক অরব ঝাউছায়া সঙ্গীত হৃদয়ের গভীরে
তারা দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষ
একই বটবৃক্ষ নীচে
ঈশ্বরের ধ্রুবপদকে খুঁজে পায়—
যেখানে এখনও পরশুরামের কুঠার এসে পড়েনি।

কোলাজ

অমরকুমার দাস

এই দুপুরে চললে কোথায়
হাতে বর্ণমালা
জীবন জেনো আগুন ফাগুন
মহাকাব্যের গোলা
ঢাল তলোয়ার প্রয়োজন নেই
মাটির প্রতিমা
যখন যেমন তখন তেমন
দেখায় মহিমা

বেঁচে থাকা

কৌশিক দাস

অহমিকার দেওয়াল ভাঙো
চাঁদের বুক থেকে একফালি
জ্যোৎস্না ছেঁচে সোহাগ করো।
আকাশস্পর্শী ডানা মেলে—
বাষ্পের তোরঙ্গ ভরাও।

শূন্য শয্যায় বেহুঁশ প্রেম
শেকড়ের নীচে চুঁয়ে ঢোকে প্রহসন।
নিভৃত শরীরে শ্যাওলা জমে,
কান্নার ছন্দ পাক খায় বাতাসে
মেঘলা হৃদয় নোঙর করে শ্মশানে, গোরস্তানে।

জঙ ধরা আর্তনাদ রাতের জৌলুষ বাড়ায়।
বহু-গুণিতঙ্কের নীচে চূর্ণ হয় বেঁচে থাকা।

ক্লান্তিকর দুপুর

সামিউল ইসলাম ইমন

দুপুরের রোদ ভেদ করে উড়ে যায় চিল
দূর আকাশে উড়ে বেড়ায় সাদা কালো মেঘ
হৃদয় সমুদ্রে কল্পনারা খেলা করে
ক্লান্তির চাপে বুক করে ধুকপুক
আনমনে টের পাই কল্পনার মাঝে
ডুবে থাকা প্রেয়সীর রূপ!

নির্জন ক্ষপা

পল্লব দাস

নিস্তব্ধতার চিৎকার
কানে বেজে উঠছে বার বার,
মেঘটা কেমন রাগ করেছে
কোথাও দেখা নেই তার
দীর্ঘ রাত্রি
বাতাস কেমন আত্মাকে হিমায়িত
করে দিয়ে যায়
আবার চাঁদ তাকে উষ্ণ করে তোলে।
অনুত্তেজিত ঘরবাড়ি, অমানব পথ, নির্বাক তরু,
সকলই তোমার নিগূঢ় প্রভায়
তলিয়ে যায়।
কার কাছে ধার নাও এই গভীরতা।

ভোলানাথের কারিকা

ত্রিস্তান আনন্দ

শ্রাবণ তুমি গলগলিয়ে উপচে পড়ো
তোমার জলায় এক দেহ মন ডুবতে পারি
আমার বেলায় খেয়ালী তুমি গ্রীষ্মকাতর
কারো ঠোঁটে বর্ষা'মগ্ন কারো বুকে ক্লিষ্ট ভোঁদড়।

কবি নয়

পল্লব মজুমদার

সময় প্রয়োজনগুলো পাল্টে দেয়। নিরূপায়
আমি চাইলেও থামাতে পারি না নিয়ম। বিস্ময়
যেদিকে, সংসারের স্রোতে পালাবো সেপথেই। অন্যথায়
পাহাড়ের তরঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠবেই নিশ্চয়।

ঠিক বেঠিকের মূল্য হারায় হৃদয়। মস্তিষ্ক
দায়িত্ব নেয় উপযাচকের। হঠকারী সিদ্ধান্তে
শুভেচ্ছা পাঠায় ভবিষ্যৎ। আর অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
মহাকাশের ঠিকানা বদলায় দিনান্তে।

অপর্যাপ্ত ভাবাবেগ তাই ব্যস্তই থাকে অভিনয়ে
দেহ লিখে যায় প্রেমের পদ্য, কলম হাতে কবি নয়।

ফিরতি পথে

শ্রীলা সরকার

ভাঙা বেড়ি, গেলাসের ছায়া, গন্ধপোড়া ধোঁয়া
যখন শ্বাস পোড়ে নির্লিপ্তে, আমি ঘুম হয়ে ফিরি
রাত জাগা স্বপ্নে।
আর্দ্রন্যাস ছোঁয়ায় বিলম্ব পেলেই এগিয়ে যাবে
নয়তো দিশেহারা কাক ঠোঁটে
লালসার অন্ত্যমিলে কটিবন্ধনী জুড়ে
শত সমগ্রের ফিরতি পথে—
কাঁটাগাছের রক্ত ধূপনীলি আবেদনে
যেন বলছে, তার দহনের গল্প!
অনেকটা কোটর অন্ধকারের বিভৎস আলাপ
চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে!
অদৃশ্য ভুলের সীমান্ত পেরিয়ে।

যুদ্ধ বিরতি

অনুপকুমার আচার্য

আরও কয়েক পা
এগিয়ে এসো;
কেন না, আমার পিঠ
দেয়াল ছুঁয়েছে।

এবার তোমার কথা
শোনার সময়;
আমার শুধু
বলার পালা।

এখন যে কোনো সময়-ই
যুদ্ধ বিরতি!

কবিতা হারিয়ে গেছে

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

খুঁজতে বেরিয়ে ঈশপ আর
নীতিমালার সেই পুরানো গল্পের বইগুলো...
ঠাকুরদা কিনে এনে দিয়েছিলেন
বলেছিলেন—সময়ে অসময়ে পড়ে নিতে

তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি
সারাটা কলেজস্ট্রিটের বইপাড়া
কোথাও পাইনি

মানুষ হওয়ার সেই অমূল্য কথামালা
কোথায় কিভাবে যেন হারিয়ে গেছে
কেউ জানে না...

আশাবরী

রীতেশ ঘোষ

ক্রমে সন্ধ্যা হবে
ভজন গান গাইতে গাইতে
সুরহারা আমি হবো
চলে যাব নিঃশব্দে
বসন্তের মহুয়া ছড়ানো প্রাঙ্গণে
শুধু মনে পড়বে
মায়াবী রাতে
মুক্ত ঝরানো ক্ষণ
মধুমাস এসেছিল
আমার আশাবরী বেলায়।

কিশোরবেলা

কিংকর চক্রবর্তী

কিশোরবেলার গা ছুঁয়ে দেখি
কত চুমু লেগে আছে তাতে!
তার জ্বরের পাশে জলপটির পবিত্র হাত
কোনও শিল্পীই সাহস করে
রং ছোঁয়ায়নি।
চোখের আকাশে পৃথিবীর প্রথম সকাল
মুখের মাটিতে লাবণ্যের ঘ্রাণ
বিকেলের কালবৈশাখী আমের বাগান ছুঁয়ে
ডালপালার তাণ্ডব....
দু'পায়ের হুটোপুটি অন্বিষ্ট ইশারা
আম কুড়নোর ঘোর
মাঝে মাঝে ছুঁয়ে দেখি কিশোরবেলার ভোর।

রঙিন পৃথিবী

সর্বাণী দাশ

তোমার চোখে দেখেছি
ভোরের রক্তিম আভা,
রামধনু-রঙা আবীর ছিটিয়ে
স্নান করালে আমাকে।
প্রতিটি ধমনিতে যেন
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির লাভা।

মেঘ এল তার বাহারি রূপে
ঘন কালো চুল থেকে
ঝরে পড়ল সদ্যোস্নাতার জল
ধুয়ে দিল আমার আবীর,
মিশে গেল ধূসর মাটিতে
রূপ নিল লাল পৃথিবী।

বিজারন

শুভদীপ সেন

ময়নাতদন্তের পরেও ঠোঁটে বা লিপস্টিকে,
তোমায় আমি পাহাড়ি ঝরনার মতো লিখেছিলাম
কোনও এক দেয়াল পত্রিকা'র মুখবন্ধে,
যেখানে তোমার উপস্থিতি ছিলো—
অবিরাম নোনা হাওয়ার মতো,
হাইওয়ের ধার হতে কলমীশাক তোলা
সাঁওতাল রমনী'র পোশাকি জতুগৃহের মতো!

ভেজা মাটি থেকে উইপোকার দল উড়ে যায়
গতসন্ধ্যা'র এলনিনো মোহনায়—
যে পূনর্বাসনে তুমিও এখন...
জানতে চাইছো; দাহ করবার সময় কখন?

বিশ্বগ্রাম

আব্দুল্লাহ আল রিপন

কোকিলারে ভালোবেসে যে কোকিল
ষড়যন্ত্র শানাতে শিখেছে, তার সুবর্ণ বিপণি
সকলেরই পাঠ্য আজ, সব ক্লাসে।
কাঁচা কামরাঙার মৌন মুখ তার
পাট করে সাজিয়েছে চালতেবৃতি মধুকথা
লক্ষ্মীদেবীর কোমল পাতে, রাতে রেখে আসে পূজা
গরম ভাতের মতো সফেদ কড়ির ঘ্রাণ
বেদনাওষুধ হয়ে, আমৃত্যু মৃত্যুকে ঠেলেছে দূরে।

এসেছি এ গাঁয়ে ঋণের টাকায় ঘুম কিনতে
লাবণ্য লেগেছে তাই টান ধরা ধনুক ছিলায়।

আমি তার গালের ভেতর দাঁতের মাঝারে।

কালবৈশাখী

কার্তিক পাত্র

চলমান সময়ের হাত ধরে
আকাশের নীল সামিয়ানা
হঠাৎ ঢেকে যায়
কালো মেঘের মোড়কে।
শুভমিত বিকেল
নিমেষেই বদলে যায়
শুরু হয়
পাতা ঝরার দাপুটে হাওয়া
কালবৈশাখীর লণ্ডভণ্ডময়
আরো এক অধ্যায়।

আবিষ্কার

অগস্তা মারিয়া

তোমাকে বুঝতে বুঝতে অতলান্তে রাখি প্রেম
তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে ওঁকারে হারাই ভাষা
মন্ত্র শুদ্ধ হলে কলঙ্কও হয়ে যায় করুণা অপার!

এই যে নীল ঠোঁট বেদনায় লীন হয়ে আছে পৃথিবীর ক্ষুধা, সে কি তুমি নও?
কুলুকুলু দুই কূল পলাশে আকুল, দিও প্রিয় যাহা চাও—
বুক ভেজা বৃষ্টির কাছ থেকে বুঝে নেবো গান্ধর্ব প্রেম তোমার!

বিভাজিত

নূর মহম্মদ

নিজেকেই ভাগাভাগি করি করতেই থাকি অজস্র
কিছুটা দিয়ে যাই গৃহ, গৃহস্থালীকে সামান্য
কর্ম, কর্মস্থলকে আর স্বপ্নের জন্য কিছুটা ভগ্নাংশের অনুপাতে
ভাঙতে ভাঙতে সবটাই বিলিয়ে ফেলি ক্রমান্বয়ে
টুকরো টুকরো ছড়িয়ে দিই চারিদিকময়
মানুষও আসে অজস্র গাছেরাও পেয়ে যায় আমাকে
তবুও তার থেকেই অসামান্যতম সময় রেখে দিই গোপনে
প্রিয় অক্ষরমালার জন্য আমার বর্ণময় কিছুটা প্রহর গাঢ়।

অবক্ষয়

স্বাগতা পাল

অগণিত ভক্ষক আর দর্শকের দেশে
নেই কোনো রক্ষক! নির্দ্বিধায় তাই
চিল, শকুন, শেয়াল, কুকুর, নয়তো কালপেঁচা
প্রকাশ্যে ছিঁড়ে খায় কিশলয় শরীর।
রক্তস্নাত ধাত্রীভূমি কান্নায় নির্বাক
কলমে-তুলিতে নগ্ন দেহের বিজ্ঞাপন।

প্রাণ ঈশ্বর

লহরী বড়াল চক্রবর্তী

ঐ নিঃসীম মহাশূন্যে পরম আলোকে
আলোকিত সূর্য স্নাত গ্রহতারার ব্যাপ্তি।
যেখানে পাখির শিষের মতো শব্দে
মৃদু তরঙ্গ বয়ে চলে ব্রহ্মাণ্ডে
যেখানে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের ছন্দে
অনন্ত অন্ধকার রাজ্যের সুন্দর
সমস্ত আলোর গ্যালাক্সিতে স্ফিত
সেখানেই আমার প্রাণ ঈশ্বর
সম্পূর্ণ মুক্ত চির অনন্ত প্রেম।

গোল্লা

দিব্যায়ন সরকার

ক্ষমতা থাকলে ছুঁয়ে দেখাক শূন্য কে
বায়ুশূন্য কে, জলশূন্য কে, অঙ্কের শূন্যকে—
কাঁটা কম্পাসে মাপা ব্যাসার্ধ
লণ্ঠনের উজ্জ্বল বুকে জমে থাকা পাতলা ধূলো
কখনো শূন্যকে অনুভব করেনি।
চন্দ্রবিন্দুর বিন্দু বরং শূণ্যের শূন্যকে প্রকাশ করে
অবচেতন থেকে সচেতনের পরাবৃত্ত পেরিয়ে
শূণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সবজায়গায় পতাকা তোলে
খয়েরি টুপি পরা নাবিকের আঙুলের নির্দেশে
নির্দেশতন্ত্রে একবার শূণ্যে শূন্যতা
অন্যবারে শূণ্যে পূর্ণতা।
ক্ষণিকের মায়ায় না হয় ছুঁয়ে দেখাক শূন্যকে।

ভালোবাসা

শিবশঙ্কর বকসী

তুমি বলেছিলে 'ভালোবাসা'
এটা ছাই চাপা আগুন, এর উষ্ণতাই ভালো,
হাত ছোঁয়ালে ছেঁকা লাগে,
নিজেকে সঁপে দিলে দগ্ধ হতে হয়।

এটা শীতের রাতে ওম্ নেবার মত,
কাঁথা-কম্বলে মুড়ি দিয়ে থাকা।
মুখের ভাষায় বোঝানো যায় না,
অভিব্যক্তিতেই পরম পাওনা!

তোমার অব্যক্ত অভিসারে
ভালোবাসা তেজস্বিনী হয়,
পরম তৃপ্তিতে শুধু দেওয়া নেওয়া নয়,
তুমি আমার, আমি শুধু তোমারই হয়।

ডুব

মাসুদুর রশীদ

যদি ডুবে যাই
যদি ডুবে যেতে চাই।
ডুবে যেতে যেতে হিসেব হবে
যত সব খুচরো স্মৃতি
যতসব টুকরো কথা।

ডুবে যেতে যেতে অতলে
জট বেঁধে থাকা কথারা
বুদবুদ হয়ে উঠে যাবে
মিশে যাবে মিলে যাবে
যত ভাংতি জীবন।

বিলীয়মান

স্নেহাশিস দে

ভাসান স্রোতেই সন্ধ্যে নামুক তবে।
বুকের ভেতর আগুন যতো,
শুকনো ঠোঁটের ফাগুন যতো,
মিশে যাক সব শেষ বেলাকার গানে,
অন্য কোনোখানে....

কলমে কাগজে, মেঘেতে রোদেতে
ভালো থেকো, ভালোবাসা।
চিঠি দিও।
ভুল ঠিকানা দিয়ে, নিরুদ্দেশ থেকেই
নয় খবর দিও...
খবর দিও যে তুমি বেঁচে আছো।
বেঁচে আছো কুয়াশা হয়ে,
কোলাহলের ধরাছোঁয়ার বাইরে...

বৈশাখ ও একটি প্রেমের সন্ধ্যা

আশিস সাঁফুই

একটা ভারী মেঘ জমে যায় ঈশান কোণে
যখন তোমার চুল ছুঁয়ে দিই আপন মনে
হঠাৎ করে মন কেমনের গান বেজে যায়
তারার আলোয় যখন তোমার চোখ খুঁজে পায়
চোখের আড়াল চোখের আলো অথৈ রূপ
ঈশান মেঘে আকাশখান একদমই চুপ
সময় হাঁটে দানব হাওয়া নামল শেষে
চোখ ভেসে যায় বৃষ্টি বাদল তোমার দেশে

কবির খাতা কবির কলম উন্মনা আজ
দেখছে প্রেমের গাল ভেজানো কান্না-সাজ।

দাবদাহ

স্মৃতিমাধুরী দাস

ছায়ার আড়াল থেকে চুপিসারে উঠে আসে দাবদাহ;
নৈমিত্তিক কাজ নিমগ্ন শ্রমিক তখন,
ইট-পাতা চুলায় দাউদাউ আগুন,
বরফের স্তূপ ফুঁড়ে ক্রোধ, মাৎসর্য, নিদারুণ মোহ!
পড়শি দেওয়ালে ঘন ঘন আছড়ে পড়া করুণ সন্দেহ
গড়াতে গড়াতে নিশীথ কলরব;
আর্তস্বরের নীচে ভেসে যাওয়া গলা শব—
পেরিয়ে ক্রমশ লালাময় ফেটে বেরোয় লোলুপ স্নেহ।

মহাশক্তি

অঞ্জনা দাস

অবুঝ মনে ছোট থেকেই তোমারই গাঁথি মালা,
তুমি তো হে সবই জানো নীলকণ্ঠ ভোলা।
নটরাজের রুদ্র মূর্তি দেখেছি বারে বারে,
ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেছো, আমার হৃদয় দ্বারে।
সেটাও আমার পরম পাওয়া মনে শুধুই ভাবি,
আঘাত খেয়েও যেন তোমার শ্রীচরণে থাকি।
নিষ্ঠা ভক্তি আর বিশ্বাসে বিচ্যুতি না ঘটে,
নাস্তিক হয়ে যেন না থাকি ধরিত্রীর এই পটে।
টর্নেডো আর সাইক্লোন যখন বিপর্যয়ের দেশে,
তখন তুমি এসেছিলে আমায় ভালোবেসে।

তৃষ্ণা

অসীম মালিক

তৃষ্ণা
তুমি ওষ্ঠ ছুঁয়ো না
হাত বাড়িও না।
নদী হয়ে বয়ে যাও....

তোমার হৃদয়ের একটা কপাট খোলা রেখো

দেব দত্ত

তোমার হৃদয়ের একটা কপাট খোলা রেখো
ইচ্ছে হলেই, মিলব এসে তোমার চোখের আকাশ নীলে
ছোট্ট পাখায় হালকা রেখায় নীরব কোণে।
তোমার হৃদয়ের একটা কপাট খোলা রেখো....
ধূসর শহর নীল সে নদী সবুজ পাহাড় আসব ছাড়ি
রোদ ঝরা মাঠ শান্ত সে ঘাস শীতল দিঘী
তোমার হৃদয়ের একটা কপাট খোলা রেখো...
গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ খরা হেমন্তিকার নাড়া ওঠা
বসন্তে সে বাসন্তিকা ঝরণা আবীর রাঙানো দিন
গোলাপ মুখর নীল গিরির ঐ বাংলো বাড়ি, চায়ের বাগান
খোলা রেখো ইচ্ছে হলেই মিলব এসে তোমার বাড়ি
তোমার হৃদয়ের একটা কপাট খোলা রেখো...।

সেদিন তুমি অভিমানি

ইমানুর আলী

সেদিন রাতে পুব গগনে
উঠেছিল পূর্ণ চন্দ্রিমা
দ্যাখো নি তো তুমি অভিমানি...
মুছে যেত ছিল যত মনেতে কালিমা

বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে
ছিলাম সেদিন হাত বাড়িয়ে
আসোনি তো তুমি অভিমানি...
ছিল যত অহমিকা তোমার, চলে যেত ছাড়িয়ে

অপেক্ষায় আমার আমি ছিল
সময় যদিও কিছু ছিল
বোঝোনি তো তুমি অভিমানি...
এটা তাই তোমাকে বোঝা, অনেক প্রয়োজন ছিল।

নদী আর বাতাসের কথা

মায়ারানী সাহা

নদী বহে ধীরে ধীরে বাতাস তারে কয়
তোমার আগে চলি যদি মনে লাগে ভয়
তরঙ্গের সনে তার আছে মিতালী
ঢেউয়ের মাঝে নাচে সে যে করে কোলাকুলি
অকূলের মাঝে যদি কূল খুঁজে পাই
মনে যত ব্যথা আছে তাহারে জানাই
আমি বাতাস উড়ে চলি সবার জ্ঞাতসারে
আমার কথা কেউ বোঝে না এ ভব সংসারে।

স্বপ্ন জয়

দেবাশীষ অধিকারী

মন তখনও স্বপ্ন দেখত, আজও দেখে
পার্থক্যটা শুধু ধরনের
তখন স্বপ্ন ছিল প্রেমের
আজ শুধুই জীবনের।

হতাশা ব্যর্থতার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে
মন স্বপ্ন দেখে জীবন গড়ার
উপলব্ধি করেছে জীবনের মানে
তাই বিশ্বাস নিয়ে পথ চলেছে আবার।

নয়নতারা

কৃষ্ণা কুণ্ডু কয়াল

আমার শরীরের মধ্যে তুমি
বয়ে যাওয়া বাতাস
আমার হৃদয়ের মধ্যে তুমি
স্বর্গ সুখ।
আমার পথচলায়
তুমি একমাত্র শেষ সম্বল।
তোমার নয়ন তারায়
তাই তো আমার স্বপ্ন ভাসে
তোমার প্রেমে ও ত্যাগে
আমার জীবন আনন্দে হাসে।

স্তব্ধতা

কাকলি চট্টোপাধ্যায়

স্তব্ধতা—এক গভীর সমুদ্র,
যার চোরাস্রোতে ভালোবাসা...
বারবার ফিরে ফিরে যায়,
বারবার ফিরে ফিরে আসে।

কিছু শব্দবন্ধ মুক্তি পেতে চায়,
অবচেতনে জাগে তার স্পন্দন;
তবুও নিরর্থক সব শব্দমালা
গভীর চড়া যখন হৃদি ক্যানভাসে।

সফল প্রেমের পথ অনুসরণ করে,
নদীও বদলায় অভিমুখ;
ধীরে ধীরে অবয়ব খোলসে ভ'রে
'ভালোবাসা' আজ দৈনিক অভ্যাসে।।

নিঃশঙ্ক কবিতা

শ্যামসুন্দর গুঁই

চিরন্তন নান্দনিক শিখরস্পর্শী কবিতার
শিয়রে উঠে নেতা করে নৃত্য গীত বাদন
কেউ কবিতাকে ধূলোর চন্দন রেণু পরায়
অনেকে স্বর্ণালঙ্কার জড়োয়ার সেট পরিয়ে
তাকে বাজারজাত পণ্য করে—
তাতে কি কবিতা ভ্রষ্ট হয়?

কবি নক্ষত্রের মত ঝিকমিক করলেও
নিঃসঙ্গতা চায় না
আকাশের মেঘের মত স্রোতোবহ নির্মল হয়েও
নির্জন হতে চায় না
তবু কবিতা ময়দানের আঙিনায় ব্রাত্য
কারণ কবি নিঃসঙ্গ ভয়হীন নির্বিকার।

হালখাতা

ইন্দিরা ব্যানার্জি

দুই দেহ এক হৃদি সিন্দুকে চল আজ
সিঁদুর লেপে আঁকি স্বস্তিক, চন্দন দিয়ে লিখি ওঁ
এদের ছুঁয়ে দিই ধান-দূর্বার আশীর্বাদ;
বরণ করি গাঁদা পাপড়ি আলোচাল ছড়া কলা মাটির প্রদীপে
মঙ্গল শঙ্খ নিনাদে পুণরায় করি আবাহন;
আজ নতুন করে সকল দ্বন্দ্ব-বিষাদ-ব্যবচ্ছেদ ঘুচিয়ে
শান্তি জল ছিটিয়ে সনাতনের করি পুণরারম্ভ...

এরপর দুটি ঠোঁটে ঠোঁট জিহ্বায় জিহ্বা
অমৃত মন্থনে নামুক
এভাবেই কিছু অমৃত মাধ্যমে আমাদের হোক হালখাতা...

প্রাণের কবি

তিস্তা বেজ

শহরের স্ট্রবেরি আলোর নীচে তুমি যেন কর্ণেল
শান্ত মফস্বলে তুমি পাড়াগেঁয়ে বুড়োটা যেমন—
তবু কী অসম্ভব কবি তুমি। মন খারাপের রাতে
প্রদীপের শিখা হয়ে বুকে জাগাও আলোর ধ্বনি
তুমি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের প্রাণের কবি।
তোমার এক-একটি সৃষ্টি সন্ধ্যা দাপানো জোনাকির মতো
ছুটে যেতে যেতে রেশ রেখে যায় মনে
অন্তরে এঁকে চলে অনির্বাণ, অনবদ্য ছবি।

ওরে কোকিল

বিজয়

ওরে কোকিল অনেক দিন শুনিনি তোর গান
কুহু কুহু রবে ভরাসনি মোর প্রাণ।

তোর কলরবে আজ প্রকৃতি মুখরিত
আনন্দের জোয়ার উপনীত

ওরে কোকিল এসেছিস, গান শোনা তুই আজ
তোর কণ্ঠ শুনে বন্ধ করেছি কাজ।
ওরে কোকিল তুই গানের বাদ্য বাজা
ওরে তোর কুজন ধ্বনিটি সাজা।

ওরে এসেছিস তবে ভরিয়ে গানের আলো
তবে শোনা তোর গান ঘুচুক প্রাণের কালো
কোকিল, তুই গানের বাদ্য বাজা
কোকিল, তুই কুজন বীনাটি সাজা।

তুমি এলে

প্রণব চক্রবর্তী

তুমি এলে
আবার একটা নক্ষত্র
উঁকি দেবে অন্ধকারে

তুমি এলে
হয়তো একটা স্বপ্ন
ফুল হবে বহুদিন পরে

তুমি এলে
বাজবে সানাই
নেচে উঠবে মন

তুমি এলে
ভরে উঠবে
সবুজ শস্যের ভুবন।

আমি দু চোখ ভরে শুধু দেখবো...

আবার কাল আসব

তৈয়েব মণ্ডল

আচ্ছা, আজ কিন্তু অনেকক্ষণ হল, বেড়ানো
তোমার চোখের তারায় সাদা বকের ডানা মেলে
উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম
বিশাল আকাশ জুড়ে আনন্দ উড়ান

পাশে উড়তে উড়তে তুমি দেখালে
ওই হল এক হৃদয় সুখ
ভাগ করবো না দুজনে একসাথে নেব
আর ওই হলো শান্তি ঢাকা গ্রাম
ওইখানে হবে আমাদের ছায়াবাড়ি

বেশ, তাহলে আমি বলি—ওখানে ব'সে আমি দেখব
তোমার শরীরে ইলোরা শিল্পীদের শিল্পকলা
আকাশ নামিয়ে দেবে একঢাল স্নেহ, ভিজব দুজনে

আজ তবে আসি, বাকি কথা কাল হবে। কেমন?

নববর্ষের অস্বস্তি

ঝুনু ভৌমিক

নববর্ষের নীল সাদা স্ক্রিনসেভারটা
কলিং বেল বাজায়
পুরনো নববর্ষের নীল মনিটার।
নববর্ষ আসে হঠাৎ, রেখে যায়
অতীতের এক বুক নির্যাতনের আতঙ্ক
নিহত বিশ্বাস আর প্রবঞ্চনার রিনরিন শব্দ
নববর্ষ বুকটাকে ফালাফালা করে চলে যায়।
অনেক প্রশ্ন উঠে আসে মন থেকে
বিব্রত হতে হয়, বেখাপ্পা খেয়ালের দংশনে।
নববর্ষকে স্বাগত জানাতে ইচ্ছে করে না
ভাবতে ভালোলাগে না, অস্বস্তি হয়।

বৃষ্টিস্নান

সুদীপা সাহা

বৃষ্টিধোয়া জানলা জুড়ে
জলছবি সব নাচে গায়

অন্য সুরে অন্য তালে
জলকিশোরির নীল ডানায়।

শহরটাতে ভর করেছে
কদম গাছের সবুজ মন

বৃষ্টি রঙে রঙ ধরালো
ঘাস পাখি আর আপনজন।

ইচ্ছে

মৌসুমী মণ্ডল দেবনাথ

জীবনটা আজ প্রখর গ্রীষ্ম। একলা হওয়ার দিন
আমার ভীষণ ইচ্ছে মেঘে, ঝড়ের কাছেই ঋণ

পাখিও যেমন ভুলছে গান। এমন নিঠুর হলি
রিক্ত হলো পথের ধূলো, ফুলেরা হচ্ছে বলি

দমকা হাওয়ায় উড়ছে ছাদ। উড়ছে বিকেল ফুল
রাস্তা হাসে ক্লান্ত রোদে। মেঘ হয়েছে ভুল

এই রাস্তায় বিপদ শুধু, খেলনায় বিষম অস্ত্র
যুদ্ধ চলছে জনতার সাথে, চরিত্র হয় নিরস্ত্র

হঠাৎ কোথায় লুকিয়ে গেলি, মন হারালো মে ফ্ল্যাওয়ার
দিনগুলো সব ভয়ের হলি, শহর হলো শুধু বর্ষার

ইচ্ছে জাগে জানবো ভোর, না বসন্তেও ফুটুক ফুল
পথেই নামুক মানুষ এবার, ভরসা রাখুক নদীর কূল

তবুও

এ কে আজাদ

গুল্ম লতার মতো চেপে ধর
ঘুঘু ধরার ফাঁদ পেতে রাখো
সমস্ত কৌশল ভেঙে... গোল দাও
দেবদারু দৃঢ়তায় পরাজিত ঝড় হাঁটে না!

মুখস্ত-আইনের লক্ষ পৃষ্ঠার সংবিধান
সাড়ে তিন হাত কুঠুরির গগন
গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে; গোলাপ চারা নাও
জীবিত বটবৃক্ষের ছায়ায় শীত নামে না!

সম্পর্ক

ভীম ঘোষ

শরীরে বৃষ্টি, ঝরছে অঝোরে,
থামছে না শত চেষ্টায়,
আমাকে তাড়া করে, নিয়ে যাচ্ছে,
ওরা কারা, সর্বনাশি জীবন দর্শনে।
ছন্দহীন তালে, খুন হচ্ছে, গোপনে,
বুঝতে পারি টের পাই।
অবাধ্য মনে সম্পর্ক জন্ম নেয়
তেমনি মনের ছায়ায়, মৃত্যু ঘটে।
সজোরে বলতে পারি, আমি অপরাধী নই।

রবির গন্ধ

মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বোশেখ মানেই আকাশে বাতাসে
রবির গন্ধ ভাসে
বাংলা ভাষাও তখন আবার
নব সজ্জায় আসে।

ভুলতে বসেও ভুলতে পারি না
মাতৃভাষার ঋণ
ভুলে থেকে আমাদের হাল
সত্যি করুণ দীন।

কারণটাকি—শুনবে নাকি

রবিনকুমার দাস

ভগবানের মন্দিরেতে যাওয়ার কারণটাকি
সত্যি বলতে ইচ্ছে করে তোমরা শুনবে নাকি,
খাবার জন্য যাই না সেথা নিই না প্রসাদ হাতে
মন্দিরে যাই চুপি চুপি চটিটা পাল্টাতে!
    ফুটিফাটা চটিটার কি জানো করুণ দৃশ্য
    আমার সাথে পাল্লা দিয়ে ও হয়েছে নিঃস্ব,
    নতুন কেনার টাকা কোথায় কিনবটা কি দিয়ে
    পাল্টে নেবার সহজ উপায় মন্দিরেতে গিয়ে।
দীর্ণ-জীর্ণ চটিখানা খুলে পায়ের থেকে
সন্ধানী চোখ পড়ল গিয়ে নতুন চটি দেখে,
একটু এধার ওধার দেখে গলিয়ে দিলাম পা-টা
নতুন পরে বেরিয়ে এলাম পুরানোকে টাটা।

বৈশাখে

সুনীল মুখোপাধ্যায়

বৈশাখে এলো ঝড়
    আর এলো বৃষ্টি
টুসটুসে পাকা আম
    খেতে ভারি মিষ্টি।
গাছপালা যতোসব
    থরথরে নড়ে
বুড়োবুড়ো পাতাগুলি
    ঝরে ঝরে পড়ে।

এসে গেল বৈশাখ
    এসে গেল পঁচিশে
কবিগুরু কড়া নাড়ে
    মনের দুয়ারে এসে।

রবি ঠাকুরের দুঃখ
শাকিলা বেগম

ভেতরে ভেতরে ক্ষইছি আমি জানো কি সে কথা?
মালা আর ধূপের ঘায়ে পাচ্ছি দারুণ ব্যথা।।

পেটেন্ট আমার উঠে গেছে জবর খবর ভাইরে।
যা খুশি তাই করতে পারো চিন্তা কিছু নাই রে।।

গানে আমার নতুন সুর নতুন তাল ছন্দ।
উলাল্‌লা উলাল্‌লা নয়তো নেহাত মন্দ।।

দোহাই ভাইরে একটা কথা এবার শোনো মন দিয়ে
ছিনিমিনি খেলো না আর রবি ঠাকুর নাম নিয়ে।।

নববর্ষ তাদের
সমীর বেতাল

নববর্ষ তাদের জন্য
নেইকো যাদের অভাব,
নববর্ষ তাদের জন্য
ফুর্তি যাদের স্বভাব।
নববর্ষ তাদের জন্য
নেই যার পেটে টান,
নববর্ষ তাদের জন্য
অর্থ যার সম্মান।

ছড়া
শুধু বিঘে দুই
আশিস ভৌমিক

মনের মধ্যে জাগছে আশা
জমির দামটি হচ্ছে খাশা।
কলকাতা ঐ ধীরে ধীরে
এগিয়ে আসে মোদের গাঁএ।

সুযোগ বুঝে চুপিসারে
কেউবা কেনে জলের দরে।
দালাল রা সব মোড় মোড়ে
হুমকি যে দেয় ঠারেঠোরে।

জমির বাজার এখন আগুন
দালালরা সব বলছে ভাবুন।
সরকার দেবে মাসোহারা
তাই আমি আজ জমিহারা।

সহজিয়া কবি শিবাতা তোয়ো প্রবীর বিকাশ সরকার

৯৮ বছর বয়সে এসে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে এসে চিত্রাঙ্কনে হাত দিয়েছিলেন। অসামান্য ছবি এঁকেছিলেন। দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসাও অর্জন করেছে চিত্রগুলো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। জাপানে কবির শততম জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রদর্শিত হয়েছিল। এমন ঘটনা ব্যতিক্রম নাও হতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রমটা অন্য জায়গায় এবং বিস্ময়কর! ব্যতিক্রমটা আপন প্রতিভাশক্তির অন্বেষণকৃত অদম্য প্রাণশক্তির মধ্যে।

বাংলাদেশে প্রায়শ শোনা যায় যে, কাকের সংখ্যা আর কবির সংখ্যা এক। এটা যে কত বড় শিশুসুলভ মিথ্যে কথা তা জাপানের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, যাঁরা কবিতা লেখেন এবং কবিতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন তাঁদের অবশ্যই জানার কথা যে, জাপানে কবির সংখ্যা অগনন। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে জাপান নদী ও কবিতার দেশ। ৩ লাইনের ক্ষুদ্র হাইকু কবিতা প্রধানত প্রকৃতিভিত্তিক কবিতা বিশেষ। ঋতুভিত্তিক বর্ণনা ও ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠানাদির তালিকা যাকে বলা হয় 'সাইজিকি' তা হাইকুর জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ কিন্তু ক'জন কবিতা লেখেন প্রকৃতি নিয়ে?

জাপানে শিশুকালেই ৩ লাইনের ক্ষুদ্র কবিতা হাইকু লেখার চর্চা ঐতিহ্যগত। ফলে পরিণত বয়সে জাপানিরা হাইকু লেখা ভোলেন না। বার্ধক্যে তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য যখন অনুভব করেন তখন মনের অজান্তে হাইকু আওড়ান বা চলে আসে যা তারা লিখে রাখতে বিলম্ব করেন না। সুতরাং বলা যায় ১২ কোটি জাপানি সবাই কবি, অন্ততপক্ষে হাইকু কবি। হাইকু কবিদেরকে বলা হয় হাইজিন। ৯০ বছর বয়সে যিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি যে হাইকু লেখায় পারদর্শী তা আর না বললেও চলে। কবিতা হয়তো লেখা যায় কিন্তু ছবি আঁকা বোধকরি আরও কঠিন এক কাজ। ছবি আঁকতে গেলে প্রতিভার সুতোয় টান পড়ে। তারপরও কবিতা লেখা গেল এবং ছবিও আঁকা হলো জীবনের জুবুথুবু সময়ের প্রান্তে এসে কিন্তু সেগুলো পাঠক এবং দর্শকনন্দিত হয়ে বিপুল সাড়া জাগাবে এটাই বিস্ময়কর ব্যাপার! বাস্তবত নতুন কবি ও নতুন চিত্রশিল্পী যথাক্রমে শিবাতা তোয়ো এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে সেই আশ্চর্যজনক ঘটনাই ঘটেছে। দুটোই ব্যতিক্রম না বলে উপায় কী!

আলোচ্য সেই কবি শিবাতা তোয়ো, ১৯১১ সালে তোচিগি-প্রিফেকচারে জন্ম

একজন অতিসাধারণ গৃহিণী ছিলেন। যখন তিনি ৯৮ হলেন তখন একমাত্র পুত্র শিবাতা কেন্‌ইচি'র অনুরোধে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন একটি ছোট্ট নোটখাতায়। সেটা 'কুজিকেনাইদে' বা 'হতাশ করো না' শিরোনামে আটপৌরে অবয়বে ২০০৯ সালে জিহি শুপ্পান বা স্বব্যয়ে প্রকাশিত হলে পরে রাতারাতি ৪০,০০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়! ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় পাঠকমহলে। ফলে আসুকা শিনশা নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গ্রন্থটিতে আরও কিছু নতুন কবিতা সংযুক্ত এবং প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে বাজারে ছাড়ে। সেটা বহুলপ্রচারিত দৈনিক সানকেইশিম্বুন পত্রিকার কালাম 'সকালের কবিতা'-র নির্বাচক-সম্পাদক খ্যাতিমান কবি শিনকাওয়া কাজুয়ে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন যা সহসা ব্যাপক প্রচারণার সহায়ক হয়। এই সালেই গ্রন্থটির মোট ১.৫৮ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়! সাধারণত জাপানে ১০,০০০ কপি কবিতার বই বিক্রি হলে সেটাকে সফল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এত কপি বিক্রি মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে গ্রন্থটি বহু বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এঁদের মধ্যে খ্যাতিমান মহিলা চ্যানসন কণ্ঠশিল্পী কুবো তোওয়াকো'র দৃষ্টিতে এলে পরে তিনি একটি কবিতাতে সুর দিয়ে গানে রূপান্তরিত করেন এবং সেটা এন এইচ কে বেতারে প্রচারিত হয়। গানটি এরকম : 'বহুজনের ভালোবাসায় আলম্বিত হয়ে এখনকার এই আমি', বস্তুত তাঁর প্রতিটি কবিতাই এরকম একেবারে সাদামাটা সহজসরল কথায় সমৃদ্ধ। যেমন কয়েকটি কবিতায় তিনি বলছেন :

কবিতা - ১

টপ টপ করে
টেপকল থেকে ঝরছে অশ্রু
বিরামহীন

যতই যন্ত্রণাবিদ্ধ
মর্মপীড়া থাকুক
সর্বক্ষণ
নিস্তেজ হয়ে থাকা
খারাপ

সব ছেড়ে ছুঁড়ে
টেপকল বন্ধ করে
একবারেই সব অশ্রু
ভাসিয়ে দাও

এখন, নতুন কাপে
চলো কফি করি পান।

কবিতা - ২

পট থেকে
ঢেলে দেয়া
চা
কোমল
আলাপচারিতা যেন

আমার
হৃদয়ের চারকোণা চিনির টুকরো
কাপের মধ্যে
উৎফুল্ল মনে
মিলেমিশে যায়।

কবিতা - ৩

নব্বই পেরনো এখন
প্রতিটি দিন
বড় মূল্যবান

কপোল-স্পর্শক বাতাস
বন্ধুর থেকে আসা ফোন
সাক্ষাৎ করতে আসা লোকজন

প্রত্যেকেই
আমাকে
বেঁচে থাকার শক্তি
যুগিয়ে যায়।

কত নিরাভরণ পংক্তি কিন্তু সুদূরব্যাপী তরঙ্গায়িত। ফলে রাতারাতি শিবাতার কাব্যগ্রন্থ মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হতে থাকে। পত্রপত্রিকায় আসে তাঁর সংবাদ ও সাক্ষাৎকার। ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর এন এইচ কে টিভির বিখ্যাত চলমান সিরিজ 'হিউম্যান ডকুমেন্টারি' অনুষ্ঠানে তাঁকে ধারণ করা হয়। ২০১২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত 'কুজিকেনাইদে' মেদহীন কাব্যগ্রন্থটি বেস্ট সেলার্স-এর মর্যাদা ধরে রেখেছিল। জানুয়ারি মাসেই নতুন সংস্করণসহ গ্রন্থটির বিক্রির সংখ্যা ২ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছিল! তাঁর কবিতার আবৃত্তির ডিভিডিও এখন পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাঁর কবিতা দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি প্রভৃতি দেশে অনূদিত হয়েছে সেসব দেশের জাতীয় ভাষায়। ৩০টির অধিক কবিতা ও আলোকচিত্র নিয়ে প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছে এক ম্যাসব্যাপী।

কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি শিবাতা ২০১১ সালে তাঁর শতায়ু প্রাপ্তির শুভক্ষণে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হিয়াকুসাই' বা 'শতবর্ষী' প্রকাশ করে পুনরায় সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। সেটাও বহু সংখ্যক কপি বিক্রির রেকর্ড করেছে। হতাশাগ্রস্ত কিংবা বার্ধক্যে নিরুপায় জাপানিদের মনে এক বিষম ধাক্কা দিয়ে গেছেন এই শতবর্ষী কবি।

২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি শিবাতা তোয়ো বার্ধক্যজনিত অসুখে ১০১ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন অহেতুক জটিলতাহীন অদম্য শক্তি উদ্রেককারী নির্ভেজাল অভিজ্ঞতালব্ধ একাধিক বাণী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

লেখক : জাপান প্রবাসী শিশুসাহিত্যিক, কথাসাহিত্যিক এবং গবেষক।

হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন এবং এই ধর্মের বক্তা কোনো একজন ব্যক্তি নয়, একাধিক উর্ধ্বরেতা ঋষির (ধ্যান ও তপস্যার ফলে অর্জিত) আধ্যাত্ম জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। কালানুক্রমিক ধর্মের উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত শিখা এক ঋষি তাঁর সুযোগ্য শিষ্যকে দান করে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন। সেকালে লেখার সরঞ্জাম না থাকায় লেখার চল ছিল না। গুরুর কাছে শুনে শুনে মনে রেখে ধারা বজায় রাখতেন। এভাবেই বৈদিক যুগে চতুর্বেদ রচিত হয়। বর্তমান যুগে ছাপার অক্ষরে চারটি বেদ, পুরাণ, বেদান্ত তন্ত্রশাস্ত্র, উপনিষদ, গীতা মহাভারত, রামায়ন সব ধর্মগ্রন্থই পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায় জানতে পারে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত হলেও আধ্যাত্ম জ্ঞানে পূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছালে কোনো মতভেদ থাকে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আর্য ধর্মের ব্রহ্মসাধনা কালের বহুপূর্বে ভারতবর্ষে আর একটি সাধনার চল ছিল, সেটা 'সর্পসাধনা'। দক্ষিণ ভারতে নাগভূমি (বর্তমানে বিদর্ভ) অঞ্চলে নাগজাতি বাস করত। তাদের ঈশ্বর সাধনার উপকরণ ছিল সর্পসাধনা। সর্পসাধনা মানে সাপের সাধনা নয়, শরীরের মেরুদণ্ডের নাড়ী (নার্ভ) তন্ত্রের উপাসনা। শরীরে মেরুদণ্ডের আকৃতি অনেকটা সাপের মত বলে সর্পসাধনা বলা হত। এতে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হত। বৈদিক ধর্মের ব্রহ্ম সাধনাতেও গোপনীয়তা রাখা হত। যোগ্য শিষ্য ছাড়া আসল বিষয় জানানো হত না। এই শক্তি সাধনা, বৈদিক ব্রহ্মসাধনার থেকেও হয়ত জনপ্রিয় ছিল। ফলে জনমেজয় নাগজাতি নিধনে সর্পযজ্ঞ করে তাদের বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমর্থ হননি এবং মহামুণি ব্যাসদেব তার মহাভারতে নাগমাতা কদ্রু এবং গরুড় মাতা বিনতার সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে নাগজাতির ঈশ্বর সাধনার প্রমাণ এবং মর্যাদা রেখে গেছেন।

নাগজাতির সর্পসাধনা মধ্যপ্রাচ্যেও বিস্তার লাভ করেছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় মধ্যপ্রাচ্যের ইউফ্রেটিস অববাহিকায় সর্পসাধনার রীতি ছিল। গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় শিল্পকলার নিদর্শনে সর্পপূজা (Serpent Power) বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের মিশরে ফারাওয়ের দুই ভ্রূযুগলের মধ্যে সর্পপ্রতীক আঁকা থাকত। মেসোপটেমিয়ার মন্দিরেও সর্পমূর্তি দেখা গেছে। নাগজাতির সর্পসাধনা-তন্ত্রসাধনা, শক্তি সাধনা, কুণ্ডলিনী সাধনা নামে পরবর্তী যুগে প্রবর্তিত হয়ে পরিচিতি লাভ করে এবং বর্তমানেও বহুল পরিচিত ঈশ্বর সাধনা 'তন্ত্র সাধনা'।

আগেই উল্লেখ করেছি নাগজাতির সর্পসাধনা মানে শরীরের মেরুদণ্ডের সাধনা। মেরুদণ্ডের নার্ভতন্ত্রই সকল কর্মের কর্তা এবং ঈশ্বর সাধনার শক্তিতত্ত্বও এর মধ্যেই নিহিত।

স্বাধীনতার সুখ

প্রভাস ভদ্র

হেমেন দত্ত হররোজ সফেদ পেল্লাই বড় সাইজের বিলিতি কুকুরটাকে নিয়ে প্রাতঃ ভ্রমণের নামে হৃষি সেনের বাড়ির সামনের রাস্তায় বার কয়েক এদিক ওদিক করে। গূঢ় উদ্দেশ্য অন্য। অনেক মানুষের যেমন সকালে পেটে চা না পড়লে বেগ আসে না। বিলিতি কুকুরদেরও নাকি তেমনি সকালে কিছুটা হাঁটাহাঁটি না করলে পটি পায় না। সভ্য বিদেশে তো কুকুরের মালিক সঙ্গে ঠোঙা প্যাকেট নিয়ে বের হয়। ধরে তুলে কাছের ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। কিন্তু এখানে! হৃষি সেন তক্কে তক্কে থেকে আজ হেমেন দত্তকে ধরে বললো, এটা কেমন কথা!

কি কথা!

রোজ আমার গেটের সুমুখে আপনার কুকুরকে কেন পটি করান! শুনেছি, আদরে বিছানায় শোয়ান, বাথরুমে স্নান করান তো পটিটাও তো কমোডে করাতে পারেন।

সমস্যাটা তো সেখানেই। বিলিতি তো। ওদের পটির অভ্যাসটা একটু অন্যরকম।

আপনার বাড়িতে তো রাস্তার কুকুর দুটোকে আদর খেতে দেখি। ওদের সঙ্গে এদের তফাতটা ঠিক বুঝবেন না।

কেন বুঝবো না! হৃষি সেন যেটুকু যা জানে শুনিয়ে বললো, কথা হলো রোজ আমার বাড়ির সামনেই পটিটা করান কেন!!

কি করবো বলুন! ওখানটাই যে ওর পছন্দ। দাঁড়িয়ে থেকে দেখবেন। গেটের সামনে এলেই কেমন দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি মোটামুটি ওর সব মনের ইচ্ছা-কথা বুঝতে পারি।

আমিও। আমার বাড়িতে আপনার দেখা কুকুর দুটির অনেক কথাই বুঝতে পারি। একসঙ্গে দীর্ঘ দিন থাকলে, ভালোবাসলে এমনটি হয়ে থাকে।

হেমের দত্ত কিছু উত্তর দেয়ার আগেই মস্তানি ঢঙে দিশিদ্বয় এসে হাজির। ব্যস শুরু হয়ে গেল, জাত কুল বর্ণ আর ধনী গরীবের অহং আত্মসম্মান নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি খিস্তির তরজা হুঙ্কার। পথে কদাপি দেখা হলে হামেশা এমনটি হয়ে থাকে। সামান্য সময়। তারপর নিজে থেকে অল্পক্ষণেই নির্বাক স্তিমিত শান্ত হয়ে যায়। আজও তেমনটি হতে হৃষি সেন জিগ্যেস করল, আপনি নাকি সবই বুঝতে পারেন! বলুনতো ওরা এতক্ষণ কি বলছিল?

আমি তো আমারটির কথাই শুধু বলেছি। আপনিও তো নাকি সবই বোঝেন, বলছিলেন। আপনিই আগে বলুন শুনি।

শুনুন তাহলে বলি। হৃষি সেন যা বুঝেছে বোঝালো, তা হলো ঃ

দিশিদ্বয় বিলিতিকে আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে বলেছে, এয়ার কন্ডিশনের ঝাঁ চকচকে সুখ ভোগের বাড়ি ছেড়ে পথে নেমেছিস কেন! তোর তো গলায় বেল্ট লাগানো বন্দী সুখের জীবন। আমাদের মতো স্বাধীনই না। তোর আসল মালিকের বিদেশের সুখ ভোগের জীবনও তো তাই। যার কাছে তোকে রেখে গেছে সে তোর আসল মালিকের মতো

সুখভোগে না থাক আমাদের মতো স্বাধীনতার আনন্দে তো আছে। যতদূর জানি, তাই তো ছেলের শত অনুরোধ আহ্বানেও সাড়া না দিয়ে বুড়িকে নিয়ে এখানেই স্বর্গ সুখ আঁকড়ে।

কথা বলা শেষ হতে হৃষি সেন কিঞ্চিৎ বিব্রত লজ্জিত হলো। অবাক বিস্ময়ে দেখলো, হেমেন দত্ত ম্লান হাসছে। হাত বাড়িয়ে দু'হাতের মুঠোয় হৃষির করতল ধরে বললো, ইয়েস—।

বর্ণপরিচয়

সোমনাথ বেনিয়া

বাসে উঠে দাঁড়িয়েছি, আমার পিছন-পিছন এক বয়স্ক লোক উঠলেন এবং আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাসের গায়ে লেখাটি দেখে আমার সামনে বসে থাকা যুবক ছেলেটিকে বললেন—সিটটা ছেড়ে দেবেন। এটা সিনিয়র সিটিজেন।
আমিও লেখাটি দেখলাম। শোনা মাত্রই ছেলেটিও অতি সাবলীলভাবে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং লেখাটির দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলল—নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য সিট যখন, আপনারাই বসবেন। এরপর দু-জনেই চুপ। উত্তাপহীন দুটি শীতল মেরু! একজন সিনিয়র যার জীবন শেষের দিকে, আর একজন জুনিয়র যার জীবন সবে শুরু হয়েছে। এই জীবন তাদেরকে আর কী-কী দিতে পারে ভেবে, আমি মানসদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম, ওই দুটি মেরুর মাঝখানে একরাশ বিস্ময় নিয়ে পড়ে আছে, বাসের গায়ে লেখা ওই দুটি শব্দ—ইমারজেন্সি এক্সিট।

মানুষ-অমানুষ

সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

সুপর্ণা টেবিল থেকে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল তেরোটা মিস্‌ড কল। সোস্যাল নেটওয়ার্কে চ্যাট করা বন্ধু নীলেশের সাথে এক দু'বার কথাও হয়েছিল। আবার ও কথা বলতে চায়। বারে বারে ফোন করে।

কথাবার্তায় সুপর্ণার মনে হয়েছিল—ভদ্র শিক্ষিত নম্র সহিষ্ণু আরও কত কি, একজন ভালো ছেলে বলার পক্ষে যথেষ্ট। ভিডিও চ্যাটে একবারও ধরার চেষ্টা করেনি।
বাড়ির ছাদে গাছের পরিচর্যা করছিল নেমে এসে দেখে তেরোটা মিস্‌ড কল। ফোন করল সুপর্ণা।
—হ্যালো বলুন। নীলেশ বলল।
—আমার ফোনে মিসড্ কল দেখলাম; আপনি তো—
—কিছু বলতে চাই, —মানে কথা। একটু সময় দেওয়া যাবে? সশরীরে মুখোমুখি বলতে চাই।
—আমার সাথে কি কথা? ঠিক আছে, আজ বিকেলে নামখানা স্টেশনে। কথার মধ্যে সংকোচ ছিল।
—প্ল্যাটফরমের প্রথম বেঞ্চটায় থাকব—নীলেশ বলল।

সুপর্ণার দিদি মারা গেছে মাস খানেক হলো। বছর তিনেকের ছেলেকে রেখে। শ্বশুর আছেন—রিটায়ার্ড টীচার। জামাইবাবু কলকাতা ট্রাফিকে। বাচ্চাটাকে নিয়ে খুব বেসামাল। অনেক করে মেসোমশায় হাতে ধরে, অনুরোধ করে গেছেন—বাচ্চাটার দেখভালের জন্য। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন, মায়ের অভাব তুমিও পূরণ করতে পারো মা। প্রয়োজনে... আমাদের কারোর আপত্তি নেই।

বিকেল চারটে কুড়ি। স্টেশনে পৌঁছে সামনের সীটে বসে নীলেশ। সিমেন্টের আসনে বসে চারিদিকে লক্ষ্য করছে। ট্রেন বমি করে দিল যেন বদহজমের কারণে। কে সুপর্ণা? এ পর্যন্ত অনেক কথা হয়েছে। পছন্দ অপছন্দের অনেক ব্যক্তিগত মতও আদান প্রদান হয়েছে। নীলেশ নিজেকে অবিবাহিত বলেছে।

মহিলা বগি থেকে নেমে সোজা সেই জায়গায়। সুপর্ণা অবাক হলো। কাউকে তো দেখতে পাচ্ছে না, একজন বসে আছে— চোখে গগল্‌স, এতো সেই জয়ন্তীর বর। নাম অনিমেষ। কিছুদিন আগে স্ত্রীর কন্যা জন্ম দেওয়ার কারণে পিটিয়ে মোর কড়িকাঠে ঝুলিয়েছিল।

নামকরণ

দীপক আঢ্য

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে প্রথমবার বাবা হয়েছে সৌমিক। ফুটফুটে কন্যা সন্তান। আজ পৌরসভার অফিসে রেজিস্ট্রেশন করাতে যাবে সে। মেয়ের নামকরণ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে বাড়িতে। স্ত্রী স্নেহা বারবার বলেছে এমন কিছু নাম রেখো যা সমর্থক হয় আগুন কিংবা প্রতিবাদের। বহু তালিকা ঘেঁটেছে সৌমিক। কোনো নামই মনঃপুত হয়নি। তবুও পরিবারের পছন্দ করে দেওয়া গোটা তিনেক নাম সাথে করে পৌর-অফিসের দিকে এগোতেই রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে কে যেন বলে উঠল, আমার মেয়ে হলে কী নাম রাখব জানিস? থমকে দাঁড়াল সৌমিকের পা। উৎকর্ণ হ'ল কান। এতদিন ছেলেগুলোকে কেবল রকবাজ-ই ভেবে এসেছে সে। মুহূর্তে ভুল ভাঙলো।

অফিসের রেজিস্ট্রেশন ফর্মে মেয়ের নাম লিখল সৌমিক 'আসিফা'।

হাততালি

মহেশ্বর মাজি

ড. অনির্বাণ চৌধুরি পায়েলের রিপোর্টটা হাতে নিয়ে একেবারে চমকে উঠলেন, অবিশ্বাস্য। এমনও হয় নাকি?

পায়েলের বাবা মৃণালবাবু। ডাক্তারের কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেলেন। টেনশন করতে শুরু করলেন। তবে কী আবার কোনো দুঃসংবাদ।

ড. চৌধুরি চেয়ারে বসে মৃণালবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আরে বাবা এত চিন্তা করছেন কেন? ...পায়েল খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করছে। ওর এই ম্যাজিকের

পিছনে ঈশ্বরের করুণা না ও নিজে দায়ী বলতে পারছি না। ...তবে এটা নিশ্চিত যে এই কঠিন যুদ্ধটা ও জিতে যাবে। এতক্ষণে মৃণালবাবুর মনে জমে থাকা দুশ্চিন্তার মেঘগুলো ঘনীভূত হয়ে টপটপ করে দুগাল বেয়ে ঝরে পড়ল। ড. চৌধুরির তা দেখে বলে উঠলেন, আপনি পায়েলের বাবা, আপনি ভেঙে পড়লে আপনার মেয়ে কাদের কাছে লড়াই করার সাহস পাবে বলুন? যদিও ভেঙে পড়ার মত তার মানসিকতা নয়। তবু আপনারা ওর আপনজন।

মৃণালবাবু চোখদুটো মুছে মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলেন, আসলে আমি সত্যি সত্যিই ভেঙে পড়েছিলাম। আমাদের একমাত্র মেয়ে তো। বড় আদর আর স্নেহে বড় করেছি ষোলটা বছর। তাই যেদিন থেকে দুঃসংবাদটা পেয়েছি। দুচোখ এক করতে পারিনি।

ওকে ছাড়া আমাদের বাঁচাটা যে কত কঠিন এই একটা মাসেই জেনে গেছি। তাই দিনরাত আল্লা, গড আর ভগবানের সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করেছি। যেন আমার মেয়েকে আমাদের কাছে ঠিক আগের মত করে ফিরিয়ে দেন। আজ আমি নিশ্চিত তিনি কোথাও না কোথাও আছেন। ...আমি খুশির আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম স্যার।

ড. চৌধুরি বলে উঠলেন, যান গিয়ে মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আসুন। আর আপনার মিসেস আসেননি?

—আসতে চেয়েছিল। আমিই আনিনি। মেয়ের এমন চেহারা দেখে নিজেকে একটুও সামলাতে পারে না। শুধু কান্নাকাটি করবে। এটা তো ঠিক নয়।

—ও... আচ্ছা। ...যান।

পায়েলের চোখদুটো একটু লেগেছিল। শব্দটা শুনে ভেঙে গেল। এই শব্দটা শোনার জন্যই সে সমস্ত যন্ত্রণা আর লড়াইকে দাঁত চেপে সহ্য করে চলেছে। জিততে তাকে হবেই। ভেঙে পড়ার জন্য সে পৃথিবীতে আসেনি। জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত সে লড়াই করে যেতে চায়। তার দুচোখে দেখা স্বপ্নগুলোকে কিছুতেই হারতে দিতে চায় না।

...চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিনের অডিটোরিয়াম হলটা। ছোট থেকেই নাচের প্রতি তার অদ্ভুত একটা আকর্ষণ তৈরি হয়। টিভিতে লাইভ শো ডান্স প্রোগ্রামে পারফরমারদের নকল করত। সেই দেখে তার বাবাই একদিন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন পায়েলকে নাচের ক্লাসে ভর্তি করে দেবেন।

এক মাসের মধ্যেই একজন দক্ষ নর্তকী হয়ে উঠল।

বয়স খুব জোর সাত, আট হবে তখন। নাচের মাস্টারমশাই পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। এ মেয়ে একদিন বিশাল বড় ডান্সার হবে। কত্থক, ভরতনাট্যম, ভাঙড়া, ওডিশি এমনকী রবীন্দ্র নৃত্য পর্যন্ত করায়ত্ব করে ফেলল মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে। তার নাম, ডাক শ্রীরামপুরের ছোট্ট চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কোলকাতার জনসমুদ্রে ভেসে যেতে লাগল। তার পড়ার ঘরে বই-এর থেকে ট্রফি আর সম্মানপত্র বেশি জমে উঠল।

তা দেখে পায়েলের বুকটা খুশিতে ভরে উঠত।

...তারপর একদিন এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। 'ইন্ডিয়া ড্যান্স হান্টার 'এর অডিশন। নিক্কো পার্কে বিশাল স্টুডিও তৈরি করা হয়েছে। তাকে নিয়ে অনেকের আশা ছিল।

জাজরা আগেভাগেই তার সমস্ত সার্টিফিকেট দেখে নিয়েছিলেন। তাই তারাও নিশ্চিত ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া থেকে ষোল বছরের মিস পায়েল ঘোষ মুম্বাই যাচ্ছেই।

মানুষের চাওয়া, পাওয়ার সাথে উপরওয়ালার হিসেবটা ঠিক মেলে না। তাই সেদিন অর্ধেক নাচ হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে পায়েলের ছন্দ, তালে ভুল ধরা পড়ল। রং স্টেপে ভরে উঠল তার পারফরমেন্স। এই অবস্থায় তাকে জিতিয়ে দেওয়াটা নিয়ম বহির্ভূত কাজ। সকলের সহানুভূতি পেলেও সেদিন পায়েল প্রথম কোনো প্রতিযোগিতায় হেরে বাড়ি ফিরেছিল।

কারণটা হল একটা গোড়ালির ব্যথা। নাচের মাঝে হঠাৎ করে জেগে উঠেছিল। একদম অসহ্য তার যন্ত্রণা। তবু পায়েল বলেই নাচটা পুরো করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মঞ্চ থেকে নেমে ছিল। মনের ভিতর কতটা শক্তি থাকলে এটা করা যায়। সবাই সেটা অনেক পরে জেনে ছিলেন। প্রথমটা সকলে ব্যাপারটাকে একটা ছোটখাটো মোচ টোচ বলে ধরেছিলেন। তাই তার বাবা সেদিনে বাড়ির পাশে একজন জানাশোনা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন।

কয়েকটা ব্যথার ঔষুধ আর লাগাবার মলম দিয়েছিলেন। তার সাথে নুন জলের সেঁক। সাময়িক উপশমের পর ব্যথাটা আবার জানান দিতে লাগল।

এবার তার বাবা সোজা অর্থোপেডিকের চেম্বারে নিয়ে গেলেন। সেখানে কটা রিপোর্ট করাতেই ভয়ানক সত্যটা ধরা পড়ল।

তার গোড়ালিতে ক্যান্সার হয়েছে। তার বাবার মাথাটা বন বন করে কয়েক পাক ঘুরে গেছিল, কথাটা শুনে। বাকরুদ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। চোখের জলকে কত কষ্টে আড়াল করেছিলেন। তিনিই জানেন। পায়েলের মুখটা দেখে বার বার ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

বাড়ি পৌঁছে পায়েলকে খবরটা দিতে গিয়ে তিনি তাসের ঘরের মত কাঁদতে, কাঁদতে ভেঙে পড়েছিলেন। কাঁদেনি শুধু পায়েল নিজে। শান্ত গলায় বলে উঠেছিল, চিন্তা করো না বাপি। তোমার মেয়ে এই যুদ্ধটাও জিতে দেখাবে। তোমরা শুধু হাততালিটুকু দিয়ে যাবে।

...একদম ঠিক। পায়েলের এই রিকোভারের পিছনে ওই হাততালির শব্দটাই প্রধান কারণ। সে জেগে, নিদ্রায় ওই একটাই শব্দ শুনতে পায়। হাজার, হাজার করতালির শব্দ! তাকে যেন সবসময় কাছে আসার জন্য দুহাত তুলে ডাকছে। তাকে ফিরতেই হবে। সে হারবে না। এতদিনের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নগুলো এমনি শেষ হয়ে যেতে পারে না। সে কিছুতেই শেষ হতে দেবে না।

আটিজম্ শান্তা কর রায়

শেষ বসন্তে বৃষ্টি হতে পারি আপত্তি নেই তো? —এমনি কিছু বলেছিল দিশা। ধর্মীয় -রাজনৈতিকভাবে আফিসা হতে পারবে না। পরম্পরায় দৈবঘটনা ঘটে না। বিন্ধ্যারণ্য অজ্ঞতার পাঠশালা। মা, বাবার মানুষ করার দোষ নয়।

প্রতিবন্ধকতায় সারল্য থাকে বেশিরভাগ সময়। অন্ধত্ব মানসিক হলে আচরণ ইশারা থেকে বেরিয়ে আসে স্নেহ। সমাজ অটিজম আক্রান্ত। এককথায় অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার।

সেদিন থেকেই পূব দিকের রোদ নিয়ে বসতে হলো। আলপথের ধারেই বডি সনাক্ত না হওয়ার পরও উৎসাহ কমাতে পারেনি। কারণ নারীদেহ। ধানের শিষের রোদ চকচকে রঙ। একমাথা চুল। কে যেন বলল, মরার আগে যদি পেতাম। দিশার চকচকে চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। ঝিঁঝির ডাক। শুনতে পেলো যেন এই সকালে। বটপাতার ওপরে বসা হাল্কা পাখিটা কি দেখছিল? অথবা বকুল ফুলটা, যেটার বোঁটা শক্ত ছিল অথচ ঝরে গেলো। দীঘিতে যে আকাশ ছবি আঁকতে ব্যস্ত ছিল, সেও বৃষ্টির আঁচড় কাটলো যেন। হাই তুলতে গিয়ে সূর্যমুখী থামলো কিছুক্ষণ। চারপাশে গুমোট বাড়ছে। ভেঙে পড়ছে বুকফাটা শব্দে। কার কাঁধে হাত রেখেছিল মেয়েটা!! হয়তো আগুন হয়ে ওঠার আগে দুদণ্ড শান্তি খুঁজেছিল সে। তার দৌড় এখন বিদেশ। প্রবাসী নাগর অন্য ডালে বসেছে বলে এতো অভিমান!! ওতো ভালো আছে, দুবেলা খাওয়ার আগে খায়, ঘুমানোর আগে নেট চেক করে। আরে, ওকে লগ্ন দাও, ঘর বাঁধুক অন্যকারোর সঙ্গে। আর প্রত্যেকদিন ভোরে রক্তবমি করুক। শুভ নববর্ষ।

রক্ষক মৈনাক দত্ত

—দাদা। মহা কেলোর কীর্তি হয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল জগা।

নীরেন তখন সবে সকালের চা খেয়ে ফোন নিয়ে বসেছে।

ভাবছিলো রথীনকে বলবে স্টোনচিপ এর অর্ডারগুলো এবার থেকে জগাকে দিয়ে দিতে।

—কেন রে রথীন কিছু করলো না কি?

—করলো মানে? একে তো সব কাজ নিজের হাতে রাখছে, তার ওপর কাল রাতে যেখানে ইট আনলোডিং হচ্ছিল সেখানে গিয়ে বাওয়াল করেছে। কিছু ছেলে জোগাড় করে ভাঙচুর করেছে। আমাকে ফোন করেছিল ডাব্বু। আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম। লাইন পাইনি। ডাব্বুকে তাই বলেছিলাম ইটগুলো বাঁচাতে। একটু হাতাহাতি হয়ে গেছে ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে গেছে। সকালে ডাব্বুর বৌয়ের ফোন। পুলিশ এসে ডাব্বুকে

তুলে নিয়ে গেছে। এখন কিছু করো। নাহলে রথীনের বড্ড বাড় হয়েছে, আমি কিন্তু ওকে ছাড়বো না।

ঠিক আছে। আমি দেখছি। তুই যা এখন নীরেন বলল।

জগা চলে যেতে রথীনকে ফোন লাগালো নীরেন।

—তোর কবে আক্কেল হবে বল তো। সামনে লোকাল ইলেকশন। এর মধ্যে এইসব কেউ করে? আর যদি করবিই, আমাকে একবার জানাবার প্রয়োজন বোধ করলি না? এতো লায়েক হয়ে গেছিস তোরা? বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলল নীরেন।

—তুমি দাদা জানো না জগা ডাব্বুকে নিয়ে কি করে বেড়াচ্ছে! এমনকি তোমার পেছনে ভুলভাল বলে বেড়াচ্ছে তুমি একদল থেকে আরেক দলে এসেছো, এসে কাঠি করছো। তুমি জানো? রথতলার মোড়ের ওই লেনিন মূর্তি ভাঙার তাল করছে? রথীন বলে গেলো এক নিমেষে।

তাই নাকি? যাক, তুই কেসটা তোল। ডাব্বুর বৌ এসে বেফালতু কান্নাকাটি জুড়েছে এখানে। বেরোবো একটু। হাই কমান্ড ডেকেছে।

—কিন্তু এসব কি ব্যাপার? বলল রথীন, —ওরা যদি লেনিনের মূর্তি ভাঙে আমরাও কিন্তু ওদের মূর্তি ভাঙবো।

—ছিঃ ছিঃ! বলল নীরেন, মূর্ত্তি কি ওদের আমাদের বলে কিছু আছে? ওসব ভাবিস না, আমি দেখছি।

রাত সাড়ে নটা নাগাদ পার্টি অফিস থেকে ফিরে নীরেন সবে টিভি চালিয়েছে, দেখলো কারা যেন লেনিনের মূর্তি ভেঙেছে।

যদিও ঘটনাটা ত্রিপুরায় ঘটেছে, তবু কেমন যেন লাগলো নীরেনের। হাজার হোক লেনিনের সামনে কতোবার দাঁড়িয়েছে সে। কতো কথা শুনেছে ওঁর সম্বন্ধে লাল পার্টির রমরমার সময়ে। রাশিয়ান রিভোলিউশন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ফিডেল কাস্ত্রো। যদিও সে এখন অন্য দলে—কিন্তু ওই গেরুয়া পার্টি—কিন্তু এখানে!

যা যা ওরা করবে তার বিরুদ্ধে লড়তেই হবে। —ভাবল নীরেন, হাই কম্যান্ডের স্পষ্ট লাইন, কোনোরকম ফ্যাসিস্ট শক্তিকে মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না। নীরেনের মনে পড়লো রথতলার মোড়ে লেনিনের মূর্তিটা, খানিক অবহেলায় দাঁড়িয়ে আছে—রথীন, ডাব্বু, পটলা, সবাইকে ফোন করলো নীরেন।

লেনিনের মূর্তির সামনে আয়। রথতলায়। এখুনি।

নীরেনের কথার ওপর কেউ খুব একটা কিছু বলে না। শুধু জগা একটু আমতা আমতা করে বলেছিল, সেকি দাদা, —এতো রাতে আমরা লেনিনের মূর্তির সামনে গিয়ে কি করবো!

—সবই যদি তুই বুঝতিস তা হলে তো হয়েই যেতো! ধমক দিয়েছিলো নীরেন।

—ও পাড়ায় আরো কিছু মূর্তি আছে যে ডাব্বু একটু চিন্তিত কণ্ঠে বলল।

কার কার?

জানতে চাইলো নীরেন।

—যেমন, কোনো এক ফুটবলার, আর এক কোন স্বামীজির আর এক কি যেন নাম।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলল নীরেন।

মোটামুটি জনাছয়েক ছেলেকে দিয়ে মূর্তি পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করল নীরেন— আজকের রাতটা তোদের একটু কষ্ট করতে হবে, —বলল।

—কিন্তু একটা রাত পাহারা দিয়ে কি হবে? তারপর? কাল, পরশু—

—আমি দেখছি, প্রেসের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি মূর্তির ছবি ছাপিয়ে দেওয়া যায় খবরের কাগজে, সঙ্গে খবর তাহলে আর সাহস পাবে না, প্রশাসন থেকেও কিছু ব্যবস্থা নেবে। আমি দেখছি।

ফিরতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল লেনিনের মাথায়, দুই চোখে, কপালে কাকে পটি করে রেখেছে। খারাপই লাগল নীরেনের। যদিও এখন সে অন্য পার্টিতে, তবু—

—ওরে কেউ জল সাবান দিয়ে মূর্তিটা একটু পরিষ্কার করে রাখিস, কাল প্রেসের লোক এসে ছবি তুলবে।

পূর্ণিমা

সুবীর দাস

আজ চতুর্দশী। চাঁদের আলোয় মাছের একটা পিঠ শুকিয়ে নিয়ে অন্য দিকটা উল্টে ঘুঁটের উপর রেখে দিলো পূর্ণিমা। ভাবলো ঘরে যাই। মরদটা কী করছে একবার দেখে আসি। অবশ্য ঘর বলতে তেমন কিছু নয়। মগডালের একটু নীচে যেখানে মূল কাণ্ড থেকে বড় ফ্যাকড়াটা বেরিয়ে গেছে সেখানেই পাতা-পুতি বিছিয়ে ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকা দিনের বেলা।

যা ভেবেছে ঠিক তাই। কোথায় গরম গরম মাছ ভাজা খাবে দু'জনে বসে, তাই নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি রান্না চাপালো; আর এসে দেখে মরদটি ঠিক পালিয়েছে। মাস জ্বালিয়ে খেয়ে এসে এখন ক'টা হাড় নিয়ে বেঁচে আছে; তাকেও জ্বালিয়ে খাবে বলে বসে আছে।

এত করে বলা হলো তাকে, ওরে সিকিউরিটি চেক ইন-এ ধরা পড়ে যাবি ক্যামেরা সঙ্গে নিস না। ঠিক বুদ্ধি করে ফাঁকি দিয়ে ক্যামেরাটা এখানেও নিয়ে চলে এসেছে।

তা বাপু, এই ক্যামেরা নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। এটা সত্যি কথা, ছবি তুলতে পারতো বটে লোকটা। কাউকে বুঝতেও দিতো না কখন ছবি তুলছে। তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে যখন দেখাতো, চমকে যেতে হতো।

এই করেই তো গোল পাকালো। ওই যে বামুন বাড়ির কচি শাঁসালো বউটা পড়লো ঠিক প্রেমে, মরদটাও কম যায় না। প্রেম করেছিস কর। তা বলে কেলেঙ্কারির একশেষ। অথচ লোকটা তো এমন ছিল না বরঞ্চ লোকটাকেই তো একপ্রকার জোর করে...। তারপরেই তো লোকটা গলায় দড়ি দিতেই সে-ও আগুনে ঝাঁপ দিলো। এই ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপেক্ষা করতে থাকে।

চাঁদটা তখন ডুবি ডুবি করছে। কাদা-মাদা মেখে ২৬টা দাঁত বের করে এগিয়ে আসছে লোকটা। ৬টা তো কবেই ডাক্তারে উপড়ে নিয়েছে। হাই চাপতে চাপতে আর বামুনদের সেই কচি বউটার কথা ভেবে মাথাটা ছিলো গরম হয়ে। ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলো পাকা বেলটা। আর ঠং করে আওয়াজ হলো। গোঁ গোঁ শব্দ। লোকটাতো মাটিতে পড়ে গেছে। লাফ দিয়ে ডাল থেকে নেমে পাশের দীঘি থেকে জলের ছিটে দিতে দিতে ধড়ফড়িয়ে উঠে লোকটা বললো,

—ছবি দেখবি পুন্নিমে?

এ লোকের ওপর আর কী করে রাগ থাকে?

মাছের কাঁটাটা ছাড়িয়ে দিতে দিতে পূর্ণিমা বলে উঠলো—

—যা, তুই এবার জন্ম নিবি যা। আমি আসছি তোর কয়েকমাস পরেই। খবরদার, বামুন বউয়ের ছবি তুলেছিস তো...

ঘুম থেকে উঠে পূর্ণিমা দেখে, মরদটা তার পাশে নেই। কেবল ক্যামেরাটা পড়ে আছে। ক্যামেরাটা আদর করতে করতে হেসে উঠলো পূর্ণিমা।

দায় দীপক মুখোপাধ্যায়

কার শেডে গাড়ি ঢুকলো বে।

গরমকালের দুপুরে প্লাটফর্মে পাখার তলায় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলো। ঢেঁকুর তোলা স্বপ্নটা ভেঙে গেলো চিৎকারে।

ল্যাংড়া, ভূতো, কেষ্টা সব দৌড়াচ্ছে। গাড়ি প্লাটফর্ম ছেড়ে ঢুকছে কার শেডে। ধীর গতিতে ট্রেন ঢুকছে। ওরা সব উঠছে ট্রেনের ফাঁকা কামরায়। যে তাড়াতাড়ি কামরায় উঠে খালি বোতল বেশি কালেকশন করবে তার উপার্জন তত বেশি হবে। বছর দশেকের এঁড়ে কার্তিক একটু পেছনে পড়ে গেলো। তার স্বপ্নটা দেখাই কাল হলো।

আরে এতো দেরি করলি কেনে কেতো? তুই তো আজ বোতল পাবি না। কেতো দাঁত দেখিয়ে হাসলো।

ভুতো আজ বেশি খালি বোতল পেয়েছে। তাছাড়া এই দঙ্গলের মধ্যে ওর বয়েসটা একটু বেশি। সে কায়দা কানুন ভালো বোঝে।

এঁড়ে কার্তিক আরও কয়েকটা খালি বগিতে সিটের তলা, বাথরুম, মায় ব্যাংকগুলো বাদ দিলো না। সে পাঁচটা খালি বোতল কুড়িয়ে পেয়েছে। একটু হতাশ দেখালো তাঁকে। বন্ধুরা তাকে এঁড়ে কেতো বলে ডাকে। কারণ তার লিকলিকে রোগা শরীর।

আবে এই এঁড়ে আজ তোর পড়তা খারাপ। গোটা গাড়ি মাথায় করে নিয়ে গেলেও তুই কিছুই পাবি না। চল চল ডেরায় যাই। পরের ট্রেনটা তুই চেক করবি। তোকে আমি হেলপো করবো। ভুতো কেতোর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলো।

সিটের নীচে একটা ব্যাগ। ব্যাগের মুখে চেন। চেন খুলে দেখলো কেতো ব্যাগের ভেতর অনেক টাকা উঁকি মারছে।
আরে ব্যাগে কি আছে রে কেতো। জিজ্ঞেস করলো ভুতো। ব্যাগটা খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো বুকে। তারপর দৌড় দৌড়। ভুতো সবাইকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। ব্লেড দিয়ে চিরে দিলো তার শরীর। রক্তাক্ত কেতো বুকে ব্যাগ জড়িয়ে ধরে রক্ত ভেজা শরীরে জি আর পির বড়বাবুর টেবিলে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলো। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য কেতো বড়বাবুর টেবিলের পাশে গড়িয়ে পড়লো।
এতে অনেক টাকা আছে বড়বাবু। ট্রেনের সিটের নীচে পেয়েছি।
প্রাণ আছে কি না বোঝা গেলো না। তার আধ খোলা চোখ যেন বলছে বাবু, যার টাকা তার হাতে তুলে দেবেন। আমার শেষ ইচ্ছেটা একটু পূরণ করবেন বাবু। আধ খোলা চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেলো। বড়বাবু বললেন যাঃ ছেলেটা কি মারা গেলো নাকি?

তাক

প্রবীর সাহা

আজকের রাতটাই শেষ রাত। সন্ধ্যাতারা ঘুমিয়ে পড়েছে—আমার চোখে ঘুম নেই। আমার আজন্মকালের বাস এই একটা ভাড়া ঘরে আমাকে রেখে-মা কবেই চলে গেছেন। আগামীকাল এই ঘর ছেড়ে আমাকে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে।

এই ঘরে একটাই তাক। মায়ের বড় প্রিয় ছিল এই তাকটা। থাকত লক্ষ্মীর পট দেবদেবতার ছবি, নিত্যকর্মপদ্ধতি একখানা, মাটির প্রদীপ, ধূপদানি... চুলের ফিতে, সিঁদুর কৌটো... সেটা অবশ্য বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর ব্যবহার হয়নি... আর একটা মাটির ভাঁড়—সংসারের খরচ বাঁচিয়ে জমানো কয়েকটা খুচরো টাকা...

এই বাড়িটা এবার ভেঙে ফেলা হবে, এই ঘরটা, এই তাকটাও ধুলিস্যাৎ হবে।

মা চলে গেছে, আমি উত্তরাধিকার সূত্রে ভাড়াটিয়া। আমি থেকে গেছি—অক্ষম অকর্মণ্য, স্বল্প রোজগেরে অবিবাহিত—প্রায় প্রৌঢ়। ভাইয়েরা যে যার ফ্ল্যাট কিনে চলে গেছে, আমি পড়ে আছি।

ওই তাকটার কাছে গেলে আমি মায়ের গন্ধ পাই। দেখতে পাই গোল সিঁদুরের টিপ পরা মায়ের ঝলমলে চেহারা।

এই ঘরে আমার সঙ্গে থাকে একটা টিকটিকি—'কিনু গোয়ালার গলি'তে যেমন থাকত। আমরা দুজনেই টিকে যাব অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে।

শৈশবের স্মৃতির মধুরতা বারবার ফিরে আসছে। তাকটা ভালো কাঠের, বেশ মজবুত, হয়তো পুরনো কাঠের দোকানে গিয়ে অন্য কোনো আসবাবে পরিবর্তিত হবে। আরও উজ্জ্বল হবে। রাত্রি শেষে আমি মিশে যাব জনারণ্যে...

লাইভ টেলিকাস্ট

সুদীপ্ত

আমার হাজবেন্ড ভীষণ লিবারেল। আজ পর্যন্ত কোনো কিছু করতে আমাকে বাধা দেয়নি। গোপার কথা শুনে ছ্যাঁক করে উঠল সৌমি - ও বাবা, আমারটা জাস্ট অপজিট। সবেতেই বাধা।

গোপা ফিসফিস করে জানতে চাইল, আমার মতো হাজবেন্ডের সামনে তাকে খুব গ্যাস খাওয়াস? সৌমি মুচকি হেসে বলে, না রে পাঁচজনের সামনে বরঞ্চ ও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

শুনে গোপা বলল, তাহলে গ্যাস তোকে খাওয়ায়! আসলে কি জানিস সৌমি, সম্পর্ক ওই গ্যাসের মতো। যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ লাইভ টেলিকাস্ট। গ্যাস ফুরোলেই বিজ্ঞাপনের বিরতি।

সোমনাথ নন্দীর ভালোবাসা

স্বর্ণালী দে সোম

বাংলো বাড়িতে একের পর এক সাজানো আছে মৃতপ্রায় ভালোবাসারা। মাসে একদিন করে সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণ; ভালোবাসার। শুধু রাত পেরোনোর অপেক্ষা। সূর্যর আলো ফুটলেই বাংলো ঘুরে দেখবেন সোমনাথ বাবু। হ্যাঁ উনিই বাংলোর মালিক। তাই রাতেই কাজ শেষ করতে হবে। শাবল নিড়ানির আঘাতের শব্দে ভয়ে কাঁপছে পাশের জন। হাহাকার, ক্রন্দনের সুর চড়া হচ্ছে বাংলোয়। কিন্তু কেউ আসছে না বাঁচাতে আমাদের। লোভি গার্ডেনার মাসিক মোটা মাইনের জন্য প্রতিদিন শেষ করছে আমাদের। মালিক কে খুশি করতে তার ঘরে পৌঁছে দেয় আমাদের সাদার সুগন্ধ। আমরা বাংলা বাড়ি বাগানের রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ। আমরা সোমনাথ বাবুর মুগ্ধতা, ভালোবাসা। না না শুধু ভালোবাসা নই, মৃতপ্রায় ভালোবাসা। আমাদের মৃতপ্রায় অবস্থায় প্রফুল্লিত হয় সোমনাথ নন্দীর হৃদয়।

প্রতিশ্রুতি

সুমন্ত ভৌমিক

বিয়ের আগে প্রায় ৬ বছর অন্তরার সঙ্গে পার্কে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে প্রদীপ্ত। এই সময়ে সে আর যাই বলুক আর না বলুক, একটা প্রশ্ন বেশ কয়েকবার করেছে তার প্রেমিকাকে।' বিয়ের পরে আমার বাবা-মায়ের যত্ন নেবে তো?' অন্তরাও প্রতিবার কখনও হেসে, কখনও চুমু খেয়ে বলেছে—এটা আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে! তোমার বাবা-মা তো আমারও বাবা-মা হবেন।

আজ অন্তরা আর প্রদীপ্তর ছেলে শুভমের অন্নপ্রাশন। পাঁচশো লোকের নিমন্ত্রণ। সব খাবার রান্না হয়ে যাবার পরে, টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু খাবার নিয়ে চুপিচুপি বেরিয়েপড়ে প্রদীপ্ত। ট্যাক্সি ধরে বলে গড়িয়ার অরবিন্দ ওল্ডয়েজ হোমে যেতে। ছেলের অন্নপ্রাশন, রান্না করা খাবার দিয়ে আসবে বাবা-মাকে।

ঁরবীন্দ্রনাথ ঘোষ–এর

স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রদ্ধার্ঘ

অপর্ণা ঘোষ (স্ত্রী)

রীতেশ ঘোষ (পুত্র)

আম্রপালী ঘোষ (পুত্রবধূ)

রীতশ্রী ঘোষ (পৌত্রী)

Krishanu Quaterly | Vol XXXXXI/I | Regd No.
Rs. 30.00 | R.N. 16533/68

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও বাণী আর্ট প্রেস, ৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৯ হইতে মুদ্রিত।